কথিত নারীবাদের ইতিহাস, বিভ্রান্তি ও মিথ্যাচার

ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা

ববব লুইস
ভাষান্তর : ফারিহা মায়মুনা

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

ভূমিকা	৯
ফেমিনিজমের কূটকৌশল	১১
ফেমিনিস্টদের উপেক্ষিত ইতিহাস	১৯
পিতৃতন্ত্র	৩৭
মজুরি পার্থক্যজনিত মিথ্যাচার	৫৫
ধর্ষণ জালিয়াতির মহামারি	৬০
পারিবারিক সহিংসতার মিথ্যাচার	৭৭
নারীর বিশেষ সুবিধা	৯৩
নারীবাদ নারীদের জন্যই ক্ষতিকর	১০৬
নারীবাদের প্রতিক্রিয়া	১১৬
সমাধান	১২৫

ফেমিনিজমের কূটকৌশল

নারীবাদের মিথ্যাচার এবং ভণ্ডামি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় নাহয় খানিক বাদেই গেলাম; তার আগে আসুন দেখে নেওয়া যাক—যেকোনো মতাদর্শ বিস্তারে প্রোপাগান্ডা কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে; চাই তা হোক নারীবাদ, শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদ কিংবা অন্য কোনো আন্দোলন। প্রোপাগান্ডা কী? এই প্রশ্নে আমি *মেরিয়াম ওয়েবস্টার* প্রণীত সংজ্ঞাটিই উল্লেখ করতে চাই। অভিধানটি বলছে—

> 'প্রোপাগান্ডা হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপকার, ক্ষতি কিংবা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কোনো ধারণা, তথ্য বা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া অথবা এ জাতীয় প্রভাব ফেলতে সক্ষম যেকোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা।'

অক্সফোর্ড অনলাইন অভিধানে প্রোপাগান্ডার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে—

> 'কোনো তথ্য, বিশেষত পক্ষপাতদুষ্ট বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য, যা কোনো রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি বা মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়।'

ইতিহাসের পুরোটা সময়জুড়ে জনসম্মুখে আলোচিত হয়েছে, এমন প্রায় প্রতিটি ইস্যুই প্রোপাগান্ডার আওতাভুক্ত। সত্যি বলতে, উপরিউক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী এই বইটিও তেমনই একধরনের প্রচারণা। তবে আমি একে ব্যবহার করেছি প্রকৃত ঘটনা ছড়িয়ে দিতে। নারীবাদী আদর্শের মিথ্যাচারকে ছুড়ে ফেলতে এবং একই সঙ্গে ভণ্ডামিতে ঠাসা ফেমিনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সহযোদ্ধাদের তথ্য সরবরাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের লক্ষ্যে।

ফেমিনিজমের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন (Gynocentrism) বলতে যে বিষয়টা আছে, তা বাদ দিয়ে নারীবাদ সম্পর্কে যেকোনো আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। *মেরিয়াম ওয়েবস্টার*-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী Gynocentrism হচ্ছে—

> 'নারীসুলভ আগ্রহ বা নারীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দেওয়া বা এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।'

এ প্রসঙ্গে *আরবান ডিকশনারি* বলছে—

> 'নারীকে সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়া, এমনকি অন্যের ক্ষতিসাধন করে হলেও। প্রায়শই যার ফলাফল হলো নারীর আধিপত্য।'

সবশেষে পুরুষবিদ্বেষের (Misandry) সংজ্ঞাটাও জেনে নেওয়া প্রয়োজন। নারীকেন্দ্রিকতার মতো এটিও ফেমিনিজমের অবিচ্ছেদ্য অংশ; বরং বলা ভালো এটি ছাড়া ফেমিনিজমের টিকে থাকাই দায়। *মেরিয়াম ওয়েবস্টার*-এর সহজ সংজ্ঞায় একে বলা হয়েছে—'পুরুষদের প্রতি ঘৃণা।' এসব সংজ্ঞাপর্ব শেষে এখন আমরা ফেমিনিজমের তৈরি ঘৃণা ও বিদ্বেষের গহ্বর তালাশে পুরোদস্তুর প্রস্তুত।

প্রাথমিক অবস্থায় নারীবাদের সূচনা হয়েছিল বিবাহ ও পারিবারিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের হাত ধরে। শুরুর দিকে নারীবাদীরা বিশ্বাস করত, বিয়ের পর একজন মেয়ের পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাদের অনেকে বিবাহকে চিহ্নিত করত দাসত্বেরই ভিন্ন একটি রূপ হিসেবে। শুধু তা-ই নয়, নিজ মতের সমর্থনে তারা যুক্তি দেখাত—সমাজ পুরুষদের যে অধিকার দিয়েছে, তার বেশির ভাগ থেকেই বঞ্চিত হয়েছে নারীরা। সাদা চোখে তাদের অভিযোগ ন্যায়সংগত বলেই মনে হয়, কিন্তু ভেতরের কথা মুদ্রার অপর পিঠের মতোই সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রথম দিককার নারীবাদীদের এই দাবি সত্য যে, পুরুষদের মতো অধিকার নারীদের কখনোই ছিল না। কিন্তু মুদ্রার উলটো পিঠটা তারা কখনোই বলে না। নারীদের যে পুরুষ সঙ্গীর এত এত দায়দায়িত্বও ছিল না, সে কথা বেমালুম চেপে যায় তারা। অথচ নারীবাদীরা এমন একটি বিষয় লুকোনোর চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত, হাজার বছর ধরে যা সর্বজনবিদিত। অধিকার ও প্রাপ্য নির্ভর করে কে কতটুকু দায় সামলাতে পারে—তার ওপর। সহজভাবে বলতে গেলে— একজন মানুষ যত বেশি দায়িত্ব পালন করবে, তত বেশি অধিকার তার প্রাপ্য।

যুদ্ধের সময় নারীদের জন্মভূমি রক্ষা করার প্রয়োজন হয়নি। একটা সময় পর্যন্ত তাদের অর্থনৈতিক দায়ভার পুরোটাই বহন করত স্বামীরা। সন্তান জন্মদান, লালন-পালন এবং পরিবারের সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ছাড়া আবহমানকাল ধরে প্রায় তেমন কিছুই করতে হয়নি নারীদের। এসবের বাইরে সবকিছু প্রধানত স্বামীকেই সামলাতে হতো। বর্তমানে নারীবাদী আদর্শে যদিও সামান্য পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু মোটাদাগে এখনও এই আন্দোলন বিয়ে ও পারিবারিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত বিরোধী। এখনও তারা দায়িত্ব-কর্তব্যমুক্ত অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তির অলীক খোয়াবে বিভোর! এজন্য দেশে দেশে লড়াই, সংগ্রাম, আন্দোলনে রাজপথ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তারা। ফেমিনিজমের বিভিন্ন উপদল (Subset) এবং ধাপ (wave) রয়েছে। তবে এই বইয়ে আমরা সেসবের দুটি নিয়েই কথা বলব—

- যথেচ্ছা নারীবাদ (Choice Feminism)
- অন্তর্বিভাগীয় নারীবাদ (Intersectional Feminism)

আমার আলোচনা এই দুই বিষয়ে সীমাবদ্ধ করার কারণ হলো—নারীবাদের অন্যান্য সব দল-উপদলও কোনো না কোনোভাবে এই দুই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যথেচ্ছা নারীবাদকে কখনো কখনো ব্যক্তিগত নারীবাদও বলা হয়। সাধারণ ভাষায়—ভালোমন্দ তোয়াক্কা না করে নারীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্বারোপই এর মূল কথা। এ দলটি বিশ্বাস করে—যেহেতু একজন নারী সম্পূর্ণ মুক্ত, তাই ব্যক্তিগতভাবে সে যা ইচ্ছে তা-ই করার এখতিয়ার রাখে। নারীবাদের এই ধারা একজন নারীর সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক স্বাধীন পছন্দকে সমর্থন করে। এই মতাদর্শের অধীনে একজন ফুলটাইম কর্মজীবী নারী যতটুকু গ্রহণযোগ্য, ঠিক ততটুকুই গ্রহণযোগ্য একজন যৌনকর্মী বা অবিবাহিতা মা! নারীবাদের বিখ্যাত তারকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের ফেমিনিস্টদের কাছে এই ধারাটি অত্যন্ত সমাদৃত।

ফেমিনিস্টদের উপেক্ষিত ইতিহাস

নারীবাদী আন্দোলনের অস্তিত্ব না থাকলে নারীরা আজকে যেসব অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, সেসব থেকে বঞ্চিত হতো—এই ধরনের একটা তথ্য ফেমিনিস্টরা মিডিয়ার মাধ্যমে দিনরাত ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাদের মতে একটি দীর্ঘস্থায়ী পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ফলে নারীরা অর্থনৈতিক ও অ্যাকাডেমিক সফলতাসহ সর্বত্র বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আসছিল। সত্যিই কি তা-ই? বাস্তবতা বলে—ব্যাপারটা মোটেই সে রকম নয়; বরং নারীবাদীদের এই দাবি শতভাগ বানোয়াট। ফেমিনিস্টরা এক্ষেত্রে ইতিহাসের ওপর গুরুত্বারোপের বিষয়টি সর্বদা উপেক্ষা করে পালিয়ে বেড়ায়। কারণ, নারীদের ওপর একতরফা পুরুষতান্ত্রিক নির্যাতনের এই দাবি ইতিহাসের বাটখারায় একেবারেই উত্তীর্ণ নয়; বরং ইতিহাস ঘাঁটলে আপনি দেখতে পাবেন—আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও আগে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল; এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষের চেয়েও বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিল নারীরা। ইতিহাসে এ রকম ভূরিভূরি ক্ষমতাশীল নারী রয়েছেন—যাদের এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

তবে আমি এখানে অল্প কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরব। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করব—নারীবাদীরা কীভাবে তাদের নির্যাতন-নিপীড়নের মিথ্যা কাসুন্দি ঘেঁটে যাচ্ছে। কীভাবে প্রতারণাপূর্ণ শঠতায় প্রভাবিত করছে ইতিহাসের বয়ান। আমাদের প্রথম উদাহরণ আফ্রিকার দেশ মিশর থেকে। প্রাচীন শাসকদের মধ্যে মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা ছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত।

প্রকৃতপক্ষে মিশরের সাতজন রানির নাম ছিল ক্লিওপেট্রা। যদি সেখানে আদৌ পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থাকত, তাহলে সাতজন রানির মধ্যে কেউই মিশরের সর্বোচ্চ শাসক হতে পারতেন না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো— উক্ত সাতজন ছাড়াও আরও অনেক রানি পেয়েছিল মিশর। বলা দরকার, দেশটি বরাবরই ছিল নারী শাসকদের জন্য সুবিদিত। মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের পঞ্চম ফারাও হাতশেপসুত ছিলেন একজন নারী। ১৪৭৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করেন। আবার স্বামীর সাথে যৌথভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন রানি তিয়ে।

শোনা যায়, এই ক্ষমতাবান নারীর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা এতটাই বেশি ছিল যে, বিদেশি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা রাজার তুলনায় তাকেই প্রাধান্য দিত বেশি। মিশরের আরেকজন রানি ছিলেন নেফেরতিতি। স্বামীর মৃত্যুর পর মিশরের হাল ধরেছিলেন তিনি। তবে মিশর শাসন করা প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রানি ছিলেন দ্বাদশ রাজবংশের শাসক সবেকনেফেরু। অবশ্য ইতিহাসের পাতা উলটালে তার আগেও কমপক্ষে ছয়জন রানির উল্লেখ পাওয়া যায়। বাস্তবতা হলো, বিভিন্ন সময় মোটামুটি কয়েক ডজন নারী দ্বারা শাসিত হয়েছে আফ্রিকা। তাদের অনেকের আবার একাধিক ক্রীতদাসও ছিল।

১৯১৩ সালে প্রকাশিত ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়া জানাচ্ছে—একজন স্প্যানিশ নারী জুলিয়ানা মোরেল মাত্র চার বছর বয়সে গ্রিক, ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষা শিখতে শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি পদার্থবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, নাগরিক আইন ও ধর্মশাস্ত্রে বিস্তারিত তালিম নেন। ১৬০৮ সালে জুলিয়ানা যখন আইনে তার প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রিটা অর্জন করেন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর।

সে সময় যদি নারী নিপীড়নকারী পুরুষতান্ত্রিকতা থাকত, জুলিয়ানার পক্ষে কখনোই প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হতো না। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিপীড়িত ছিলেন না; আর দশজন সফল ব্যক্তির মতোই তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। সেই প্রচেষ্টা মোটেই বৃথা যায়নি; বরং সম্মান ও সাফল্যের পসরা নিয়ে ফিরে এসেছিল তার জীবনে।

আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমি জোয়ান অব আর্ক এবং ইতিহাসজুড়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ শাসন করা কিছু রানির কথা উল্লেখ করব। আপনারা যদি এ প্রভাবশালী নারী শাসকদের সম্পর্কে আরও সবিস্তারে জানতে চান, আমি সুনিশ্চিত যে ইন্টারনেটে ইউরোপিয়ান ইতিহাস অনুসন্ধান করলেই তা পেয়ে যাবেন।

মজুরি পার্থক্যজনিত মিথ্যাচার

মূলধারার মিডিয়া, নারীবাদী কর্মী এবং নারীবাদের হর্তাকর্তারা হরহামেশাই প্রচার করে বেড়ায়; পুরুষ ও নারীদের মজুরির ক্ষেত্রে ব্যবধান রয়েছে। তাই তাদের দাবি—যেহেতু নারীবাদীরা মজুরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার, তাদের আরও বেশি সুরক্ষার প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা ১২ মাস বিচিত্র গবেষণা, জরিপ এবং অন্যান্য চেষ্টা-চরিত্র করে ঘনঘন নিজেদের দাবির সত্যতা জানান দিতে থাকে। অথচ পুরো বিষয়টাই পুরোদমে ভাঁওতাবাজি। এক্ষেত্রে মজুরির ব্যবধান সম্পর্কিত ভুয়া নিউজের প্রতিবেদনগুলোর জুড়ি নেই! মূলধারার প্রায় সবগুলো মিডিয়াই এই অপরাধের সমান অংশীদার। জানি বক্তব্যটা উগ্র শোনাচ্ছে। কিন্তু মিডিয়ার এই মিথ্যাচারের প্রমাণ এতই বেশি যে, এর ওপরে গোটা একটা চ্যাপ্টারই লেখা সম্ভব। এতে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ধাপ্পাবাজির অকাট্য বাস্তবতা এবং যথাযথ প্রমাণ পেশ করা সহজ হবে।

আমি এখানে মজুরি ব্যবধান সম্পর্কে মিথ্যাচারের রহস্য উদ্‌ঘাটন করছি না, ইতিহাস ইতোমধ্যেই এই কার্য সাধন করে ফেলেছে। ১৯৬৩ সালেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেনেডি সমনিরাপত্তা অধিকার আইনে স্বাক্ষর করেন। 'দ্যা ইক্যুয়াল পে অ্যাক্ট' নামের এই আইনের মাধ্যমে পুরো দেশে নিয়োগকর্তাদের হাত থেকে নারীদের বিরুদ্ধে মজুরি বৈষম্যের সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়।

আইনটি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি বেশ প্রাসঙ্গিকভাবেই মন্তব্য করেন—'আমি নারী-পুরুষনির্বিশেষে সমান মজুরি আইন-১৯৬৩ কার্যকর করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত, যা মজুরির ক্ষেত্রে নারীদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারী বৈষম্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। একই কাজের জন্য নারী কর্মচারীদের পুরুষদের চেয়ে কম বেতন দেওয়ার অযৌক্তিক চর্চা প্রতিরোধে এই আইনটি শ্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত একাধিক বেসরকারি সংস্থার বহু বছরের প্রচেষ্টার ফল। এই উদ্যোগটি আমাদের আইনে আরেকটি গণতান্ত্রিক কাঠামো যুক্ত করবে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের সুরক্ষা দেবে। তারা ভোট দেওয়ার যে অধিকার ভোগ করে, ঠিক তেমনি কর্মক্ষেত্রেও একই অধিকারভুক্ত হবে। আমি কংগ্রেসের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞ, যারা সমান মজুরি আইন প্রণয়নের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তারাই মূলত নারীদের কর্মক্ষেত্রে সমান মজুরির ক্ষেত্রে আমাদের সংকল্পকে দৃঢ় রাখতে সাহায্য করেছে।'

আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, সমান মজুরির জন্য নারীবাদী লড়াই অর্ধ শতাব্দী আগেই নিশ্চিত হয়েছিল। তাই যেসব নারীবাদী এবং তাদের নির্বোধ সহচররা তাদের ডাহা মিথ্যাচারকে বজায় রেখেছে, তাদের উদ্দেশে আমি বলতে চাই—ইতিহাসে সব সুস্পষ্ট, দয়া করে মিথ্যাচার বন্ধ করুন।

অন্যতম একটি সরকারি কর্তৃপক্ষ 'The Equal Employment Opportunities commission' এক দশকের পুরোনো এই আইনটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে বলেছিল—'সমান মজুরি আইনে নারী-পুরুষের একই প্রতিষ্ঠানে, সমান কাজের ক্ষেত্রে সমান বেতন প্রদান করা হবে। উভয় কাজই যে একই হতে হবে তা নয়, কিন্তু তাদের যথাসম্ভব সমান হতে হবে। পদ-পদবি নয়; বরং কর্মক্ষেত্রের বিষয়বস্তুই নির্ধারণ করবে তারা যথেষ্ট পরিমাণে সমান কি না। বিশেষত, ইপিএ মতে যাদের চাকরির ক্ষেত্রে সমান দক্ষতা, প্রচেষ্টা এবং দায়িত্বগ্রহণ প্রয়োজন, নিয়োগকর্তারা সে সকল নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে অসম মজুরি নির্ধারণ করতে পারবেন না। যেসব কাজ একই প্রতিষ্ঠানে একই পরিবেশে করা হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রেও কোনোরূপ বৈষম্য বৈধ নয়।'

অধিকন্তু, বিষয়টিকে তারা আরও স্পষ্ট ভাষায় দক্ষতা, প্রচেষ্টা, দায়িত্ব এবং কাজের পরিবেশ সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছেন। দক্ষতা মাপার মানদণ্ড সম্পর্কে সেখানে বলা হয়েছে—'কাজ সম্পাদনের জন্য বিবেচ্য বিষয় হলো—অভিজ্ঞতা, সক্ষমতা, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ। চাকরির জন্য কর্মীর কী কী দক্ষতা থাকা প্রয়োজন সেটাই মুখ্য বিষয়; কর্মীর কী কী দক্ষতা আছে সেটা নয়। উদাহরণস্বরূপ, ইপিএর অধীনে দুজন হিসাবরক্ষকের কাজ সমান, যদিও-বা একজন হিসাবরক্ষকের পদার্থবিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি থাকে, যেহেতু মাস্টার্স ডিগ্রি থাকাটা উক্ত চাকরির ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়।'

ধর্ষণ জালিয়াতির মহামারি

রবিন মরগ্যান একবার *মিসেস* ম্যাগাজিন-এ ধর্ষণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন—'যতক্ষণ পর্যন্ত না নারীরা স্বেচ্ছায় যৌনসংগমে লিপ্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে ধর্ষণ বলে বিবেচনা করা হবে।'

অপরদিকে মহামারি (Pandemic) সম্পর্কে *মেরিয়াম ওয়েবস্টার* ডিকশনারি বলছে—'বিস্তৃত ভৌগোলিক অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে পড়া রোগের উপদ্রব, যা বেশির ভাগ জনগণের ওপর প্রভাব ফেলে।'

ইতিহাসজুড়ে বিভিন্ন সময় অনেক মহামারি দেখা গিয়েছে। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো ইউরোপিয়ান ব্ল্যাক প্লেগ। ইতিহাসবিদদের তথ্যানুসারে, ১৩৩৮ সালের শুরুর দিকে এশিয়ার বর্তমান কিরগিজস্তানে এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ১৩৪৬ সালের মধ্যে ব্ল্যাক প্লেগ শেষ পর্যন্ত ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে এবং ৭০ থেকে ৮০ মিলিয়নের মতো মানুষ মৃত্যুবরণ করে। কমপক্ষে ৪৫% থেকে ৫০% অর্থাৎ প্রতি দুজনে একজন ইউরোপীয় এই রোগে মারা যায়। চিন্তা করুন, একটি রোগ কতটা ভয়াবহ হলে আপনার পরিচিতদের মধ্যে অর্ধেকসংখ্যকই সেই রোগে মৃত্যুবরণ করে! আপনার বন্ধুবান্ধব, পরিবার, সহকর্মী, প্রতিবেশীসহ সবাই। এই প্লেগ ইউরোপীয় সমাজকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল বললেও কম বলা হবে। যারা জীবিত ছিল, তারা এতটাই আতঙ্কের সাথে বেঁচেছিল যে, কুষ্ঠরোগী কিংবা ভিক্ষুক থেকে শুরু করে বহিরাগত কাউকে দেখলেই রীতিমতো দুই ক্রোশ দূরে তাড়িয়ে দিয়ে আসত। শুধু তা-ই নয়, ব্রণ এবং চর্মরোগীদেরও ব্ল্যাক প্লেগ বহনকারী সন্দেহ করে নির্বিচারে মেরে ফেলত তারা।

ব্ল্যাক প্লেগ রোগের বহু বছর পরে, বিশ শতকের শেষার্ধে আমেরিকার জনগণ আরেক মরণঘাতক এইডস রোগ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ১৯৮১ সালের ৫ জুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র কতিপয় তরুণ, স্বাস্থ্যবান সমকামী পুরুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া *নিউমোসিসটিস ক্যারিনি নিউমোনিয়া* নামক একটি দুর্লভ সংক্রামক রোগের কথা উল্লেখ করে।

এইডস মহামারির বিষয়ে এটাই ছিল প্রথম কোনো সরকারি প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বড়ো বড়ো সংবাদমাধ্যমগুলো সংবাদটি ছড়িয়ে দেয় এবং সারা দেশের ডাক্তাররা রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে একই রকম সংক্রমণের একাধিক বিবরণী পেশ করে। বছরের শেষে ২৭০ জন ব্যক্তি সংক্রামিত হয়, মারা যায় ১২১ জন।

১৯৮২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো এই রোগের জন্য এইডস শব্দটি ব্যবহার করা হয়। পূর্বের অন্যান্য মহামারির মতো এইডসের ক্ষেত্রেও লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং একইভাবে যারা আক্রান্ত নয়, তারা আশপাশের মানুষদের দমন করতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, রিকি রে নামে ১৫ বছরের এক এইচআইভি হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত বালকের কথা। ১৯৮৭ সালে তাকে এবং তার এইচআইভি আক্রান্ত ভাই-বোনদের বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতির জন্য ফেডারেল কোর্টে লড়াই পর্যন্ত করতে হয়েছিল। কোর্ট শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু সমাজের লোকজন তাদের বয়কট করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি। এর জের ধরে ১৯৮৭ সালের ২৮ আগস্ট তাদের বাড়িঘর সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রে ১৯৯২ সালে মৃত্যুবরণ করে।

আশপাশের মানুষ কর্তৃক বৈষম্যের শিকার হওয়া অসংখ্য এইচআইভি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রিকি একটি উদাহরণ মাত্র। দুরারোগ্য ব্যাধি এবং মহামারির এই ভয়ংকর ইতিহাসের সঙ্গে আমরা ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ ও তার সামাজিক প্রভাবকে মিলিয়ে পাঠ করতে চাই।

ধর্ষণ, নিপীড়ন এবং অজাচারবিষয়ক জাতীয় সংস্থা 'RAINN—Rape Abuse & Incest National Network'-এর তথ্যানুসারে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ছয়জনে একজন নারী তাদের জীবনকালে হয় ধর্ষণ, নতুবা ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হয়। উক্ত সংস্থার মতে, এর অর্থ হচ্ছে—যুক্তরাষ্ট্রের নারীদের প্রায় ১৭% ধর্ষণের শিকার। ২০১৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অ্যাসোসিয়েশনের জরিপের ওপর ভিত্তি করে একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়, যেখানে দেখা যায়—প্রতি চারজনে একজন কলেজছাত্রীই যৌন হয়রানির মুখোমুখি হয়েছে। যদিও পশ্চিমা বিশ্বে ধর্ষণকে রোগ হিসেবে গণ্য না করে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, নারীবাদীরা এটাকে ধর্ষণ সংস্কৃতির মহামারির ফলাফল হিসেবে ব্যাখ্যা করতেই সদা তৎপর। যদি ওপরের পরিসংখ্যানটি সঠিক হতো, তাহলে তাদের এই উক্তি সঠিক বলে মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। আর সেই বাস্তবতা তাদের মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।